# ৭

# ব্রাহ্মসমাজ ও কোচবিহার সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন

# ব্রাহ্ম সমাজ ও কোচবিহার সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে মনীষী কেশব চন্দ্র সেনের পারিবারিক সংযোগ কোচবিহারের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সুনীতি দেবীর সঙ্গে মহারাজের বিবাহবন্ধন এই অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক পরিবর্তনের সূচক। দূরদর্শী ইংরাজ শাসকগণ এটা বুঝতে পেরেই মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে সুনীতি দেবীর বিয়ে বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই বিবাহবন্ধনকে বলা যেতে পারে এক রাজনৈতিক বিবাহ। কেশব চন্দ্রও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। আজকের মূল্যায়নে এটা বলতেই হবে যে মনীষী কেশব চন্দ্র সেন একটি অনুন্নত দেশীয় রাজ্যকে আধুনিকতার আলোতে স্নাত করাতে গিয়ে নিজে সমালোচনার বিষে জর্জরিত হলেও যথাযথ কর্তব্য পালন থেকে পিছিয়ে আসেননি।

মহারাজ তাঁর পারিবারিক দীর্ঘ ঐতিহ্যলালিত অনেক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে এসে হাত ধরেছেন সুনীতি দেবীর। এ যেন আগুনের সঙ্গে বাতাসের যোগ, পালের সঙ্গে হাওয়ার মিলন। গভীরভাবে দেখলে এসবের অনেকটাই ব্রাহ্ম কেশব চন্দ্র সেনের প্রলম্বিত ছায়া।

"১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মাঘ তিনি একটি গৃহ নির্মাণ ও ট্রাষ্ট ডীড রচনা করে সেই মন্দির ও সমাজের স্থায়িত্ব দানের আয়োজন করেন।"[১] উক্ত ট্রাষ্ট ডীডে রয়েছে "A place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, Saber, religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal. Unsearchable and Immutable Being who is the author and preserver of the universe but not under or by any other name, designation or title peculiarly used for and applied to any Particular Being or Beings by any man or set of men whatsoever"[২] ব্রাহ্মসমাজ ট্রাষ্ট ডীডে আরো বলা হয়েছে, "Late Mahadeva Govind Ranada said, The spirituality, the deep piety and universal toleration of this document represent and idea of beauty and perfection which may yet take many centuries before its full significance is understood by our people."[৩] " রামমোহন রায় যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে মানবপ্রেম, আর্তসেবা ও দরিদ্র সেবার রূপটি অনুধাবন করেছিলেন।"[৪]

ভারত পথিক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রস্তুতিক্ষেত্র দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের প্রতিবেশী জেলা রংপুর হলেও, কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজের ঢেউ এসেছিল প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে। কোচবিহারে এই ধর্ম তেমন দানা বাঁধতে না পারলেও, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোচবিহারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া কোচবিহারের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের তফাৎও লক্ষণীয়। "দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের অন্যতম রাজধর্মের মর্যাদা পেয়েছিল ব্রাহ্মধর্ম এবং সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে এই সময়ে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন।"[৫]

ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস রচনাকার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর " History of Brahmo Samaj " গ্রন্থে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ ৫৪টি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে কোচবিহারের উল্লেখ নাই। অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি যে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে কোন স্থায়ী মন্দির গড়ে ওঠেনি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিবেদনে কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে যা লেখা আছে তা হ'ল, " The Cooch Behar Brahmo Samaj was established more than fifty years ago, when Late Rai Kalikadas Datta Bahadur was Dewan of the Cooch Behar state."[৬] এই প্রতিবেদন থেকে অনুমান করা যেতে পারে ১৮৮০ খ্রীঃ পূর্বেই অর্থাৎ সম্ভবত ১৮৭০ খ্রীঃ নাগাদ কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও সুনীতি দেবীর বিয়ের পূর্বেই কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের উদ্‌গাতা, ব্রাহ্মধর্ম তখনকার যুগে প্রগতিশীল নজির হিসাবে গণ্য হতো, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এই মত পোষন করতেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রাজার বা রাজধর্মের তখন পর্যন্ত কোন সংযোগ ছিল না। কোচবিহারে ব্রাহ্মপন্থী লোক বেশ কিছু ছিলেন। এ সম্পর্কে W.W. Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal গ্রন্থে দশম খণ্ডে লিখেছেন, "The Deputy Commissioner reports that there are a few followers of the Brahmo Samaj, although no regular Samaj has been established in Kuch Behar." ব্রাহ্মসমাজের তখনকার সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, রায় বাহাদুর কালিকা দাস দত্ত, বাবু নন্দলাল মোদক, বাবু বলমালী মিত্র, বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, বাবু রজনীকান্ত রায় প্রমুখ। সম্ভবত এরা সকলেই বহিরাগত ছিলেন এবং রাজসরকারের চাকুরী সূত্রে এরা কোচবিহারে এসেছিলেন। এদের প্রচেষ্টাতেই নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিবাহের পূর্বেই এখানে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এই পর্বে ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিবাহের সময় থেকে এই রাজ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৮ খ্রীঃ ৬ই মার্চ তারিখটি কোচবিহারবাসীর কাছে একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠাকন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিয়ের মাধ্যমেই কোচবিহারে আধুনিক ভাবনার জোয়ার আসে, রাজ্যশাসক এবং উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারে আধুনিক ভাবনার রূপকার বলা হয়। এই বিয়ে সম্পর্কে কেশব চন্দ্র সেন ম্যাক্সমূলারকে লিখেছিলেন, " It was a political marriage, a whole kingdom was to be reformed and all and all my individual interests were absorbed in the vastness of God's saving economy, in what people." বলা বাহুল্য তাঁর এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে চরিতার্থ হয়েছিল এবং বিয়ের পরে নৃপেন্দ্র নারায়ণ এই মর্মে স্বাক্ষর করেন, " I Nripendra Narayin Bhup do hereby declare my faith in Brahmo Dharma and join the faternity of Brahmo Samaj of India." [৭]

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মসমাজের কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ ছিল, সেগুলি হ'ল, "(i) to promote of moral, spiritual and human education ; (ii) to eradicate of untouchability and casteism ; (iii) to encourage inter caste marriage ; (iv) to discourage Kulin Paligamy ; (v) to eliminate prostitution and (vi) to extend equality of education to women."[৮]

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মসমাজে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হয়। অল্প কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ ' নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ' নামে পরিচিতি লাভ করে। অর্থাৎ বিরোধ যখন তীব্র, "১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন ' নববিধান ' ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ বিলেত থেকে ফিরে এলে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর কলকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে রাজা ও রাণীকে একত্র করে বিশেষ উপাসনার সাহায্যে বিবাহ বন্ধন দৃঢ় করা হয়।" [৯] এই রাজ্যের কেশব অনুগামীরাও নববিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন। সুনীতি দেবীর বিয়ের পর রাজবাড়িতে ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা ও প্রার্থনা হতে থাকে। রাজা ও রাণীর চেষ্টার ফলে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে পরিগণিত হয়। সমাজের দাবি উদ্ভূত হলে জেন্‌কিন্‌স স্কুলে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাবেলা উপাসনা হ'ত। "১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন দেহত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর আরো দু'বছর পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট রবিবার এই নববিধান ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজবাড়ির অর্থে, রাজবাড়ির আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়।"[১০] উক্ত নববিধান ব্রাহ্মমন্দিরটি ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ব্রাহ্মমন্দির। কোচবিহারের এই নববিধান ব্রাহ্মমন্দির ও সমাজ তখন রাজকীয় ঐশ্বর্যে গম্ভীর ও সুমহান। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ নববিধান সমাজভুক্ত হলেও এই ধর্মেরই অপর শাখা ' সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ' মহারাজের কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি এবং সেই সঙ্গে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রচলিত বিভিন্ন দেবসেবা নিষ্ঠা সহকারে পালন করে গেছেন। এক্ষেত্রে নৃপেন্দ্র নারায়ণ সংকীর্ণতার গণ্ডী পেরিয়ে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ যেন উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক রাজ্য কোচবিহারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকেই ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। একজন আদর্শবান শাসক হিসাবে এইখানেই তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন একথা স্বীকার করতে হবে কোচবিহারের

রাজপরিবারে প্রথাগত হিন্দু ধর্মের পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল এই সময়ে। ব্রাহ্মধর্ম রাজধর্মরূপে পরিগণিত হ'ল।

কোচবিহারের সামাজিক ও সংস্কৃতির উন্নতির মূলে অনেকটাই ছিল নববিধান ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যৌথ প্রচেষ্টা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। মহামনীষী জ্ঞানতাপস আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে "State Council"-এর অনুমোদন ছাড়াই সরাসরি নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের ধারক ও বাহক। আচার্য শীলের সময়ে ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. এবং আইন শাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। তিনি স্নাতকোত্তর সকল বিষয়ই পড়াতেন বলে শোনা যায়।

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ রাজা মহারাজাদের প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথাকে মনে মনে ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন, " It was always been my opinion that no man should have more than one wife. " [১১] বহুবিবাহ সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় বলেছেন, " Had a magistrate or other public officer been authorised by the rulers of the empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accusations as the foregoing being substantiated, the above law might have been rendered effectual and distress the female sex in Bengal and the number of suicides would have been necessarily very much reduced."[১২] " প্রাচীনকালে বহুল প্রচলিত এই সামাজিক অভিশাপের অবসানের জন্য মহারাজা নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। প্রচলিত এই কু-প্রথার জন্য মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও সুনীতি দেবী তাঁদের নিজ কন্যাদের ভারতীয় মহারাজাদের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হন নি।" [১৩]

কলকাতায় ব্রাহ্মমেয়েরা যখন আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখান ঠিক সেই সময় কোচবিহারে সুনীতি দেবীর প্রভাবে মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। তাঁর এই প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখতে পাই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুনীতি কলেজের প্রতিষ্ঠা। কলকাতা থেকে যশস্বী শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও অধ্যাপকদের এনে কোচবিহারে শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ। শিক্ষার প্রসার ব্রাহ্মধর্মের বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান। উক্ত বিষয় সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় প্রকাশিত সংবাদ কৌমুদি পত্রিকায় বলা হয়েছে, "An appeal to Government for the establishment of a school for gratuitous instruction of the poor but respectable Hindus."[১৪]

কোচবিহার রাজ্যকে কুসংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণও ব্রাহ্মসমাজের ঘোষিত নীতি অনুসারে শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী হন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন স্তরের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্রদের মানসিক বৃত্তিগুলির যথাযোগ্য বিকাশের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। "এর ফলে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষিতের সংখ্যা ১৬,৩০৫ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪,৯৮৬ জনে দাঁড়ায়। উচ্চশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে মহারাজার প্রচেষ্টায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ' ভিক্টোরিয়া কলেজ '। মহারাণী সুনীতি দেবীর রাজ্যের অভ্যন্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও কলকাতার 'Victoria Institution' ও দার্জিলিং-এর ' বালিকা বিদ্যালয় ' -এর সঙ্গে কোচবিহারের মহারাণীর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী বিশেষ উদ্যোগ থাকলেও স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় নি। কারণ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা ছিল ২৩১ জন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪৫ জন।" [১৫]

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ, মহারাণী সুনীতি দেবী ছাড়াও কোচবিহার রাজ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রাজভ্রাতা কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী কেশব কন্যা সাবিত্রী দেবী এবং মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের পুত্র ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী নিরুপমা দেবী। রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন প্রধান হিসাব রক্ষক অমৃতলাল সেন, দেওয়ান প্রিয়নাথ ঘোষ, দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জেলা কালেক্টরের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা সকলেই উচ্চ দায়িত্বশীল পদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন ১৮ জন ব্রাহ্মের ৩ জন

ছিলেন সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ' সুনীতি কলেজে 'ও ব্রাহ্মদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সময় পর্যন্ত সরকারী চাকুরীতে ব্রাহ্মদের এই প্রাধান্য অব্যাহত ছিল।

" ব্রাহ্ম আন্দোলনের আদর্শ এই রাজ্যে হিন্দু প্রজারা ছাড়াও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। ১২৯৮ সালের ' ইসলাম প্রচারক ' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে এই রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল হলদিবাড়ীর কিছু মুসলমান যুবক স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"[১৬] " রাজভ্রাতা গজেন্দ্র নারায়ণ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন সেইজন্য কোন কাজ-ই হিন্দুমতে করেন নাই। নিজে হিন্দুঘরে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে চিরদিন এই ধর্মের প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস ছিল। ইহাই তাঁর মহৎ জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।"[১৭] " ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ব্রাহ্মমন্দির ও সমাজের আচার্যের কার্য্য করেন। কোচবিহার রাজ্যে 'পর্দাপ্রথা ' প্রচলিত ছিল কিন্তু ব্রাহ্মদের যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত আন্দোলনের ফলে সেই প্রথা ক্রমশ শিথিল হওয়া শুরু হয়েছিল।"[১৮] ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ বছর গজেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারে ব্রাহ্মধর্মকে ফলে ফুলে পল্লবিত করেন। সাবিত্রী দেবী গজেন্দ্র নারায়ণ সম্পর্কে লিখেছেন, " কোচবিহারে তিনি (গজেন্দ্র নারায়ণ) ধর্মপ্রচার নিঃস্বার্থভাবে করেছেন (Sic)। ১লা জানুয়ারি হইতে প্রত্যেকদিন Unto গুলি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত। ভৃত্য সেবার দিন তিনি নিজে ভৃত্যদিগকে লইয়া আচার্যদেবের প্রার্থনা করিতেন। ৮ই জানুয়ারি আচার্যদেবের স্বর্গারোহণের দিনে, প্রত্যুষে সাবিত্রী লজে উপাসনা হইত।" আচার্যদেবের স্বর্গারোহণের দিন কুমার সাহেব বহু গরিবকে উৎসাহ সহকারে পয়সা চাউল বিতরণ করতেন। বিকালে ঐ দিন ' Lansdowne Hall ' -এ বক্তৃতাদি দেয়া হত। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে কোচবিহারে ব্রাহ্মপল্লী, ব্রাহ্মবোর্ডিং, লাইব্রেরী ও কেশব আশ্রম স্থাপিত হয়। "কেশব আশ্রমের যে গেট (Gate) তৈরী হয়, তিনি তা Milton -এর Paradise lost -এ যেরকম স্বর্গ দুয়ারের নকসা ছবিতে দেখেছেন, ঠিক সেইরকমভাবে প্রস্তুত করিয়েছেন। এরকম পরিপাটি সুন্দর ফটক খুবই বিরল।"[১৯] "১৯শে নভেম্বর কেশব চন্দ্র সেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে কোচবিহারে ' কল্পতরু ' অনুষ্ঠান হ'ত। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছোট বালক বালিকাদের খেলনা বিতরণ করা হত। সমাগত বন্ধু-বান্ধবদের প্রচুর পরিমাণে জলযোগ করান হ'ত। সে এক অভিনব দৃশ্য। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ-ই প্রথম কোচবিহারে এ সকল উৎসবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।"[২০]

কোচবিহারে কয়েকবার ' ব্রহ্মানন্দ ভোজ ' হয়েছিল। এই উপলক্ষে গরীবদের পাতা পেতে ভাত, ডাল, তরকারী, দই, মিষ্টি আবার কোন কোন মানুষকে চিড়া, দই প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো হ'ত। সকলেই তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করে যেতেন। কোচবিহারে ' সাবিত্রী লজ ' ব্রাহ্মদিগের একটি তীর্থস্থান, একটি বন্ধু সম্মিলনের স্থান, একটি পবিত্র মিলনের ক্ষেত্র।

গরীবদের দান-ধ্যানের ক্ষেত্রে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন উদার মানসিকতার এক মহান ব্যক্তিত্ব। এই সম্পর্কে সাবিত্রী দেবী বলেছেন, "গরীবকে ঔষধ-দান, বস্ত্র দান এইরূপ গুপ্তদান তাঁর অনেক ছিল। কুচবিহারে নিত্যই খড়ের ঘর পুড়িয়া যাইত। বাড়ীর জন্য গরীবদিগকে সাহায্য করিতেন। এক সময়ে কলিকাতাবাসী একটি বন্ধুকে টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সে অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারিতেছিল না। কখন যে তাহাকে তিনি গুপ্তভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া পাঠে বন্দোবস্ত করিয়া দেন, একথা আমরা পূর্বে জানিতাম না। এখন শুনিতেছি। আরও কত যে তাঁর অজ্ঞাত দান ছিল, তাহা আমরা জানি না। অনেকগুলি ব্রাহ্মসন্তান তাঁর যত্নে কুচবিহার বোর্ডিং হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন তাহারা সকলে স্বাধীন হইয়া চাকরী করিতেছে।"

একবার কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ খুব অসুস্থ হয়েছিলেন। ঘরে এক বোতল Brandy ছিল। প্রত্যেক ব্রাহ্মের-ই সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন সময়ে নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন পাঁচ হাজার শ্রোতার সম্মুখে সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে তীব্রভাবে ভারতে ' মদ্য-আইন ' - এর সমালোচনা করেন। তিনি ঐ সভায় নির্ভিকভাবে ইংরেজ সরকারকে দোষী করেন ভারতে মদ্যপান বৃদ্ধি ঘটায়। অসুস্থ গজেন্দ্র নারায়ণকে ঔষধ হিসাবে Brandy দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ডাক্তার এসে প্রত্যহ দেখতেন যে, Brandy সমানভাবেই আছে ইহা দেখে ডাক্তারবাবু অবাক হয়েছিলেন। কারণ রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সুরাপান করাকে ধর্মীয় বিরুদ্ধ কাজ বা অসামাজিক কাজ বলে মনে করতেন, শুধু এখানেই শেষ নয় তিনি তাঁর সন্তানদেরও সুরা স্পর্শ করতে নিষেধ করতেন। তিনি উপন্যাস পড়ে বৃথা সময় নষ্ট করা এবং তাস খেলে সময় নষ্ট করা একদম পছন্দ করতেন না। ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবের ফলেই শাসক শ্রেণীর উপরে উল্লেখিত পবিত্র, উন্নত মানসিকতার

পরিচয় পাওয়া যায় যার প্রভাবে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে। এখানেই যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মধর্মের সার্থকতা।

কোচবিহারে শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে রাজভ্রাতা ব্রাহ্ম কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের অবদান অনস্বীকার্য্য এবং যার সুফল বর্তমানেও কোচবিহারবাসী উপভোগ করছে। তিনি ঘুঘুমারিতে ' সাহেবের হাট ' নামে একটি হাট স্থাপন করেন। পথিকদের সুবিধার জন্য একটি পুকুর খনন করান। প্রতি রবিবার সেখানে উপাসনা করে পরে সকলে একসঙ্গে খিচুরী ভোজন করতেন। এর সম্পূর্ণ ব্যয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ বহন করতেন। কোচবিহারে ' সাবিত্রী লজ ' একটি নীতি শিক্ষার বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে একত্রিত হ'ত। এই বিদ্যালয়টিতে ভাল ভাল শ্লোক শেখানো হ'ত এবং সদুপদেশ দেয়া হ'ত। কোচবিহারে ' আর্যনারী সমাজ ' স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত সমাজে অনেক মহিলা সমাগম হ'ত। এখানেও দান, সৎসঙ্গ ও উপাসনা হ'ত। ভদ্র, শিক্ষিত মহিলারা ' সাবিত্রী লজে ' একসঙ্গে মিলিত হতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী ও বিদেশী মহিলাদের জন্য একটি ' Technical School ' স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে শিল্প কার্য্য শেখানো হত। জামা-কামিজ প্রভৃতি তৈরী করা হত। সপ্তাহে সপ্তাহে রান্না করা, খাবার ও জেলি প্রভৃতি তৈরী করতে শিক্ষা দেয়া হ'ত। ধীরে ধীরে এখানে এত বেশি মহিলা আসতে লাগলেন যে প্রায় ৭/৮টা পর্যন্ত ঘরের কাজ ছেড়ে সাবিত্রী দেবী মেয়েদের নিয়ে কাজে লিপ্ত থাকতেন। যে সমস্ত ভদ্রমহিলারা বাড়ীর বাইরে যেতেন না তারাও প্রতি সপ্তাহে আসতে লাগলেন। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য নিতে লাগলেন। এইভাবেই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে কোচবিহারে ' Basic Education ' -এর ধারণাটি আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কোচবিহারে ব্রাহ্মদের সহযোগীতায় বা পরিচালনায় তদানীন্তন সময়ে অনেক সৎকার্য্য হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল, " Young Men's Theistic Association ". ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। এই Association টির উদ্দেশ্য ছিল শুধু ব্রাহ্মরাই এর সভ্য হতে পারবেন এবং সামাজিক, ধর্ম ও নীতি বিষয়ে উন্নতি সাধন করা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা, কৃষকেরা ও অন্য নিম্ন জাতীয় লোকেরা যাতে ভদ্র সমাজে মিশে তাদের উন্নতি সাধন করতে পারে তার চেষ্টা করা এই সভার কাজ হবে। সাম্যবাদের মাধ্যমে কোচবিহারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই ছিল ব্রাহ্মদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য।

ব্রাহ্মদের সহযোগিতা এবং সাহায্য কেবলমাত্র কোচবিহারবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না কোচবিহারের বাইরেও তাঁদের এই পরশ লেগেছিল। "একবার যখন Lord Harding খুব অসুস্থ হয়েছিলেন তখন সেই উপলক্ষে কোচবিহারে একটি বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বহু দেশীয় ও বিদেশীয় মহিলারা এসেছিলেন এবং অনেক টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই সংগৃহীত টাকা ' Lady Harding Fund ' -এ পাঠিয়ে দিয়ে Lord Harding কে সাহায্য করা হয়েছিল। উক্ত মহৎকার্য্যটি ব্রাহ্মনেতা গজেন্দ্র নারায়ণের সহযোগিতায়-ই সম্ভব হয়েছিল।"[২১]

"কোচবিহারে ব্রাহ্মদের সহযোগীতায় আরেকটি সমাজকল্যানকর কাজ হ'ল, 'Band of hope' সুরাপান নিবারনী সভা স্থাপন। উক্ত সভায় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন একজন অন্যতম প্রধান Member." [২২]

"কোচবিহারের ব্রাহ্মদের আরেকটি সমাজসেবামূলক কাজ হ'ল, প্রতি রবিবার সকালে ব্রাহ্মপ্রচারকেরা জেলখানায় গিয়ে কয়েদিদের সৎপথে আনবার জন্যে উপদেশ দিতেন।"[২৩]

ব্রাহ্মরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশের উদ্দেশ্যে 'সুকথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র সিংহ ছিলেন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক। 'সুকথা' ছিল একটি মাসিক পত্রিকা। ব্রাহ্মধর্মের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকতো এই মাসিক পত্রিকাটিতে। ১৮৯৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ

" স্থানীয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপলক্ষে এই সময় বৎসরারম্ভে উৎসব হইয়া থাকে ইহার নির্দিষ্ট দিন ১০ই এপ্রিল। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ, উমানাথ, কান্তিচন্দ্র ও ফকিরদাস এবং ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী রাজমোহন অভিমুক্তেশ্বর ও মহেন্দ্রনাথ

ইঁহাদের কেহ কেহ সপরিবারে আগমন করেন। আচার্য পরিবারও এই যোগে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী মহারাজ কর্তৃক সকলেই সমাদরে গৃহীত হন। উৎসবে একদিন নগর সংকীর্তন বাহির হইত; সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে কেহ কেহ বসিতেন, সকলে রাস্তা দিয়া সংকীর্তন করিয়া রাজবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলে উপর হইতে ফুল ও গোলাপ জল বর্ষিত হইত। ''

কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাংবৎসরিক ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের উৎসবের সমারোহের কথা ' সুকথা ' পত্রিকায় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে ঃ '' দয়াময়ী বিধান জননীর ' কৃপায় ' এই অনুষ্ঠান সমাধিত হয়। ২৮-এ শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্ন সাতটার সময় ' সঙ্গীত সভা ' অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মমন্দিরে। ২৯-এ শ্রাবণ ১৩ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পারিবারিক উপাসনা হয়, এই উপাসনা ব্রাহ্মভ্রাতা রামচন্দ্র সিংহ সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে একটি বক্তৃতা হয়, ' শ্রীহরির শ্রীচরণ সেবা স্ত্রীজাতির ভূষণ ও সৌন্দর্য্য এবং তাহাতে পারিবারিক শান্তি ও কল্যাণ '। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলাদের হরির প্রসাদ দেওয়া হয়। ৩০-এ শ্রাবণ প্রচার যাত্রা হয়। কোচবিহারের নিকটবর্তী ডেওগুড়ি নামক স্থানে সংকীর্তন ও বক্তৃতা হয় ব্রাহ্মভ্রাতাদের দ্বারা এবং বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা হয়।

''৩১-এ শ্রাবণ শনিবার ব্রাহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত সংগীত ও সংকীর্তন, আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত প্রাতঃকালীন উপাসনা, ' পাপীর প্রতি ঈশ্বরের অতুল করুণা ' বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। কিছু সময় বিশ্রামের পর দুটো থেকে আড়াইটে পর্যন্ত মধ্যকালীন উপাসনা হয়, বক্তৃতার বিষয় ছিল ঃ ' সাধককে বিঘ্ন ও বাধা যে খাঁটি করে ' আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ে পাঠ হয়। সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত আলোচনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়।''

সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত নগর সংকীর্তন হয়। রাজপথে বেরিয়ে বাজারের পথ দিয়ে রাজবাড়ির সামনে এসে সাগরদিঘির পুবদিক দিয়ে জেলখানার পথ ধরে উত্তরের পথ দিয়ে আবার মন্দিরে এসে নগর সংকীর্তন শেষ হয়। অনেকে ' প্রমত্ততার সহিত কীর্তনে যোগদান করেন। ' মন্দিরে প্রবেশ করে বেদীর চারপাশে নৃত্য সহকারে কীর্তন গীত হয়। ত্রৈলোক্যনাথ-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

রাত্রি সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। পাপীর ওপরে ভগবানের কৃপা বিষয়ে বক্তৃতা হয়, বলা হয় ' সংশয়াত্মা বিনশ্যতি '।

৩২-এ শ্রাবণ রবিবার সকালবেলা উপাসনা ও সংগীত ও ঘটনার ভিতর বিধাতার লীলা বিষয়ে উপদেশ হয়। তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের চাল ও পয়সা দেওয়া হয়। জেন্‌কিন্স স্কুলে বক্তৃতা হবার কথা ছিল, কিন্তু মহরমের শব্দের জন্য হতে পারেনি। সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উৎসবের সঞ্জীবনী শক্তির মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়। শান্তিবাচনের পর পরস্পর প্রেমালিঙ্গনের মধ্য দিয়ে উপাসনা শেষ হয়।

২রা ভাদ্র মঙ্গলবার অপরাহ্ন সাড়ে ছ'টার সময় স্থানীয় উপাচার্য ধর্ম সমন্বয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নগর সংকীর্তনের গানের একটি কলি ঃ ' আনন্দ বদনে সবে গাও হরির জয়রে হইবে ব্রহ্মের জয় করো নাকো ভয়রে। ' ' সুকথা ' পত্রিকাটি যেন নবজাগরণের বার্তাবহ, দূত।[২৪] ' সুকথা ' পত্রিকাটির মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ব্রাহ্মরা ধর্মীয় এবং সামাজিক কর্তব্য একই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। '' ব্রাহ্মসমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ হ'ল বিধবা বিবাহ প্রচলেন এবং শিশু বিবাহ নিষিদ্ধিকরণ।''[২৫] একটি দেশের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। '' স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ব্রাহ্মসমাজ ঘটাতে সক্ষম না হলেও ব্রাহ্মদের প্রচেষ্টার ফলে মহিলাদের মধ্যে আংশিকভাবে পর্দাপ্রথার অবসান ঘটে এবং মহিলারা বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান করতে শুরু করে।''[২৬] তদানীন্তন সুচতুর, বুদ্ধিমান ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিলেন মহাত্মা আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের সাহায্যে অনুন্নত কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রান্তিক রাজ্য কোচবিহারের সংস্কার সাধন করা, ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের মাধ্যমে তাঁদের এই উদ্দেশ্য অনেকটাই ফলবান হয়েছিল। এইভাবেই কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ তার ভূমিকা পালন করেছে। চেতনায় ও কাজে তাকে ' আধুনিক ' করেও তুলেছে।

মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের সময়ে কোচবিহার রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার থাকলেও তাঁর সময় থেকেই আবার এই রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। ব্রাহ্মধর্ম রাজধর্ম হিসেবে পরিগণিত হলেও রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম থেকেই এই ধর্মের প্রচারে বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন এবং তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে এই ধরণের বিরোধিতা আশা করা যায়। হিন্দুধর্মের পুর্নজাগরণের জন্য Neo-Hinduism এর প্রবক্তা শশধর তর্কচুড়ামণি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে কয়েকটি সভা সমিতির আয়োজন করেছিলেন। তাছাড়াও শংকরদেবের প্রচারিত মতবাদের সঙ্গেও এই রাজ্যের মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সময়ে প্রতিবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলন দানা বাঁধলেও মহারাজা অব্রাহ্মদের উপর কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করেনি এবং কোচবিহারবাসীর ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মধর্ম বাধ্যতামূলকও ছিল না। অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন একজন উদার মানসিকতার মহান ব্যক্তিত্ব।

ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা এই রাজ্যে করেছিলেন। কিন্তু তার সুফলগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভোগ করেছেন সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ফলে ব্রাহ্মদের নবজাগরণের আধুনিক যুক্তিবাদ কোচবিহারের প্রাচীন ভক্তিবাদ মানসিকতা সম্পন্ন সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে পৌছতে পারেনি। সেইজন্য কোচবিহারের খুব সামান্য সংখ্যক জনসাধারণ-ই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। নগর ভিত্তিক আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। কোচবিহার রাজ্যে ব্রাহ্মদের অধিকাংশই ছিল কর্মসূত্রে বহিরাগত। কর্মাবসানে তাঁরা এই রাজ্য ছেড়ে চলে যান এবং এই রাজ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

ব্রাহ্ম-আন্দোলন কোচবিহার রাজ্যের জনসাধারণের অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারলেও এই আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ ব্রাহ্ম আন্দোলনকারীরাই তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সমাজ সংস্কারের দ্বারা কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে এই রাজ্যকে মুক্ত করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে আধুনিকতার আলোকবর্তিকাটিকে এই রাজ্যে প্রবেশ করান। তারই সুফল বর্তমানেও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ক্ষুদ্র জেলা কোচবিহারের মানুষেরা ভোগ করছেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়-ঃ

প্রথমত ঃ ব্রাহ্মধর্ম কোচবিহারের শাসনক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করায় কোচবিহারের শহরাঞ্চলে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর এর প্রভূত প্রভাব পড়ে।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্রাহ্মধর্ম কোচবিহার রাজ্যের আধুনিকতা আনয়নের ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী এবং প্রভাবশালী ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে এই রাজ্যে আধুনিকতার বীজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রোথিত হ'তে থাকে।

চতুর্থত ঃ রাজ ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্ম রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংস্কৃতায়নের ক্ষেত্রে প্রভূত কাজ করে থাকে।

পঞ্চমত ঃ একথা বলা চলে যে সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মধর্ম চিরাচরিত ধারাবাহিকতাকে ভেঙ্গে সংস্কার আনয়ন করতে সক্ষম হয়।

এই কারণেই দূরদর্শী কেশবচন্দ্র সেন ম্যাক্সমূলার সাহেবকে তাৎপর্যপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন — " It was a Political Marriage...".

---

সূত্র ঃ

১. তত্ত্ব কৌমুদি, ১. ১৬ মাঘ ১৪০১ পৃঃ ১৫৪

২. Rammohun Ray and Modern India / Ramananda Chatterjee P-3

৩. Ibid P-3

৪. কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ / ঝরা বসু পৃঃ ৩৫
৫. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬ পৃঃ ৩৭৩
৬. তদেব পৃঃ ৩৭৩
৭. তদেব পৃঃ ৩৭৫
৮. New view points on 19th century Bengal / Chittabrata Palit P-175
৯. কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস / বার্ণিক রায় পৃঃ ২
১০. কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস / বার্ণিক রায় পৃঃ ২
১১. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬ পৃঃ ৩৭৭
১২. Rammohun Roy and modern India / Ramananda Chatterjee. P-9
১৩. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬ পৃঃ ৩৭৭
১৪. Rammohun Roy and modern India / Ramananda Chatterjee. P-13
১৫. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬ পৃঃ ৩৭৫
১৬. তদেব পৃঃ ৩৭৭, ৩৭৮
১৭. কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ / সাবিত্রী দেবী পৃঃ ১৭
১৮. তদেব পৃঃ ২৬
১৯. তদেব পৃঃ ২৬, ২৭
২০. তদেব পৃঃ ২৮
২১. তদেব পৃঃ ৯৩
২২. তদেব পৃঃ ৯৪
২৩. কোচবিহারে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস / বার্ণিক রায় পৃঃ ৫
২৪. তদেব পৃঃ ৭, ৮
২৫. কোচবিহার দর্পণ ১৩৪৫, পৃঃ ৫
২৬. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬ পৃঃ ৩৭৬